ঈদঃ সেখানে তখন, এখানে এখন

লেখিকাঃ তাহিতি আহমেদ
যোগাযোগঃ zuzubachcha@yahoo.com
পরিচিতিঃ Born and brought up in Bangladesh, Tahiti completed her masters in Sociology from Dhaka university. Currently setttled in California, USA, Tahiti is a mother of 2 little kids and a devoted house wife. She has been interested in writing on several topics of life since she was a student. Writing provides her with a breath of fresh air when, sometimes, the daily life gets saturated.

ছেলেবেলায় যে কোন ছোট বড় খুশী কে তুলনা করতে হলে আমি বা আমরা বলতাম, “ঈদের মত আনন্দ হচ্ছে”। দুই ঈদের মধ্যে রোজার ঈদটাতেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ হত। কারণ ওই ঈদে বেড়ানো আছে, হৈচৈ আছে, আছে নতুন কাপড়ের গন্ধ। কোরবাণী ঈদেও আনন্দ হত, তবে একটা বয়স পর্যন্ত। কারণ বয়সের সাথে সাথে মাংস কোটা, বিলানো, রান্না, হেঁসেল পরিষ্কার ইত্যাদির একটা দায়ভার চলে এল, অন্তত মায়ের সাথে হাত লাগানো।

রোজার ঈদের আনন্দটা শুরু হয়ে যেত রমজান থেকেই। একটা একটা করে ত্রিশ দিন গোনা, আর, উনত্রিশ রোজায় চাঁদ দেখা গেলে তো কথাই নেই! বেলা ডোবার আগে থেকেই ধুকপুক অপেক্ষা – চাঁদ উঠবে কি, নাকি আরো এক দিন অপেক্ষা? কত সময় হয়েছে যে রাতের শেষ সংবাদটাও হয়ত প্রচারিত হয়ে গেল, কিন্তু চাঁদ ওঠার কোন খবর তাতে নেই। ‘চাঁদ দেখা কমিটি’র বৈঠক তখনো চলছে। মা খুব বিরক্ত মুখে একবার হেঁসেলে ঢুকছেন, একবার বেরচ্ছেন। ফ্রিজ থেকে মুরগীগুলো বার করবেন কিনা, মশলা পেষার আয়োজন শুরু করবেন কিনা, ফিরনীর দুধ কি জ্বাল দিয়ে ফেলবেন নাকি আরেকটু অপেক্ষা করবেন – এ কি যন্ত্রণা! তারপর হঠাৎই পাড়ায় হৈচৈ, পটকা ফাটার আওয়াজ। মসজিদের মাইকে ঘোষণা, দেশের কোন প্রত্যন্ত গ্রামে হয়ত চিকণ বাঁকা সুতোর মত চাঁদের রেখা দেখা গেছে। অতএব ‘চাঁদ দেখা কমিটি’র সিদ্ধান্ত – কাল ঈদ।

সাথে সাথে টেলিভিশনে পুরনো বছরের রেকর্ড করা অনুষ্ঠান চালু হয়ে গেল, সেই চিরপরিচিত গান “ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক”। শুরু হয়ে গেল রান্নার প্রস্তুতি, ভোরের প্রথম জামাতের ঘোষণা, এবং সব ছাপিয়ে বাবার অহেতুক হৈচৈ – এটা কর, ওটা কর, এটা এখনও হল না কেন, সেটা কখন হবে ইত্যাদি।

মা তো সারারাতই হেঁসেলে, কয়েক ঘন্টায় করে ফেলতে হবে কয়েক রকম। কাজের ছেলে বা মেয়েটিরও আজ কোনো ক্লান্তি নেই। গভীর রাতে যখন বিছানায় যাচ্ছি, এসবই চলছে; কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে খুব ভোরে যখন উঠলাম, তখনও মা হেঁসেলেই। হয়ত দুএক ঘন্টা ঘুমিয়েই ফজরের নামাজ পড়ে আবারও বাকী কাজে হাত দিতে হয়েছে। তড়াক করে উঠেই মনে হত মাথায় কাজের পাহাড়। সারাঘরের ধুলো ঝাড়া, বিছানার চাদরগুলো পাল্টে ‘ঈদ স্পেসাল’ বেডকভার ইত্যাদি বিছানো, নতুন ক্রকারিজের সেট নামানো, টিপটপ করে টেবিল সাজিয়ে দেওয়া, বাথরুমে নতুন সাবান, নতুন তোয়ালে, জনপ্রতি ছেলেদের জায়নামাজের ব্যবস্থা করা, বাবার পাটকরা পায়জামার ফিতেটা ভরে দেয়া, ভাইদের কারো পাঞ্জাবীতে আরেকটু ইস্ত্রি ঘষে দেয়া, কাজের ছেলেটিকেও নামাজের জন্য নতুন কাপড় পরিয়ে তৈরী করে দেয়া – কত কাজ, কত্ত কাজ!

তারপর হয়ত মেয়েরা একটু অবসর পেয়ে নিজেদের গোসল সেরে, ছেলেরা নামাজ সেরে ঘরে ফেরবার আগেই, কাপড়টা পাল্টে নিল। বারান্দায় দাঁড়ালেই দেখা যাচ্ছে তা – নামাজ সেরে পিঁপড়ার সারির মত মানুষ বেরচ্ছে; আবার কেউ হয়ত দৌড়াচ্ছে শেষ জামাতটা ধরার জন্য।

এরপর শুরু হত দফায় দফায় অতিথি আগমন। প্রথমত প্রতিবেশী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। প্রথমে মিষ্টি মুখ, তারপর একটাকা দু'টাকা ঈদের বখশিস, যা পাওয়া যায়। অনেকদিন ধরে লুকিয়ে রাখা, সামলে রাখা, বারবার আলমারি খুলে আবারও একটু 'ঠিক করে' ভাঁজ করে রাখা নতুন কাপড়গুলো আজ সবার গায়ে উঠেছে। সবার চেহারায় এক নির্ভেজাল আনন্দ। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। বেড়ান, বাড়ি বাড়ি মজার সব খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি চলছে কয়েকদিন ব্যাপী টেলিভিশনের 'ঈদ অনুষ্ঠান'। সরকারী ছুটির তিনদিন ধরেই এভাবে চলত ঈদ।

চলত নয়, এখনো এভাবেই ঈদ পালন হয় বাংলাদেশে, যা ঘড়ি ধরে চলা মার্কিন মুলুক থেকে আনেকটাই ভিন্ন। তারপরও আমরা যারা এখানে প্রবাসী তারা আনেকটাই চেষ্টা করি আনন্দটাকে বয়ে নিয়ে আসতে। এখানে তো আর 'ছাদে ওঠা' ব্যাপারটা নেই। Backyard-এ দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখা হয় কিনা আমার জানা নেই। প্রচুর ভারতীয় দোকান হয়ে যাওয়ায় ঈদের শাড়ী-কাপড়-পাঞ্জাবীর অভাব হয়না। ঘরে ঘরে এসে গেছে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও। তাই 'ঈদ স্পেসাল অনুষ্ঠান'গুলোও দেখা হয়ে যায়। সব কটি ছোট বড় শহরেই দেশীয় খাবারের কাঁচামাল এখন অনেকটাই সহজলভ্য। তাই সেমাই কি নানান ধরনের হালুয়া, মিষ্টি, বিরিয়ানি এমনকি পিঠে পায়েসও খেতে পাননা এমন কোনো দুঃখ বাঙালীদের আর আছে বলে আমার মনে হয়না। চাঁদ রাতে খুব ঘটা করে 'মেহেদী নাইট' হয় বলেও শুনেছি। তবে কিছু ভিন্নতা তো থাকবেই। এত বড় পৃথিবীর সম্পূর্ণ আরেক কোণায় বসে, সহস্র মাইলের ব্যবধানে, multi-culture এর এই দেশে, বাঙালীরা এতটা করতে পারছেন, তাই বা মন্দ কি?

স্যাটেলাইটের যুগে এখন রমজানের আগেই কোন কোন মসজিদে ঘোষণা হয়ে যায় ঈদের দিন। East Coast আর West Coast এ, এমনকি একই শহরের দুই মসজিদে, ঈদের তারিখ নিয়ে মতভেদ হওয়ায় এখানে দুদিন দুটো ঈদ হয়। ব্যাপারটা মজার বটে, তবে কতটা গ্রহণযোগ্য জানিনা!

শুনেছি অত্যন্ত ব্যস্ত ঘড়ি ধরে চলা মহিলারা একমাস আগে থেকেই নানারকম খাবার বানিয়ে ফ্রিজ করতে থাকেন। সম্পূর্ণ একা হাতে, নিয়মিত জীবনের পাশাপাশি একটা উৎসব ওঠানো একজন মহিলার জন্য কতটা পরিশ্রমের তা তো বোঝাই যায়!

সকালটা এখানেও শুরু হয় ঘটা করে দল বেঁধে নামাজে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। পার্থক্য শুধু, এখানে মহিলারাও জামাতে যান। আমাদের দেশে অন্যান্য শহরে তো নয়ই, এমনকি 'মসজিদের শহর' ঢাকাতেও মেয়েদের জামাতের ব্যবস্থা দু-একটা বড় মসজিদে ছাড়া কোথাও এখনো নেই। আমাদের মা খালাদের আমি কোনদিন জামাতে যেতে দেখিনি। ওখানে মেয়েরা ঘরেই নামাজ সেরে নেন।

এখানে সপ্তাহের মধ্যখানে ঈদ পড়লেও সরকারি ছুটি তো আর নয়! তাই জামাত সেরেই কাজে চলে যেতে হয়। অথবা কেউ হয়ত ছুটি নিয়ে পরিবারকে সময় দেন। কিন্তু ঈদের আসল বেড়ানোটা হয় পরের শনি-রবি-তেই। তাও ঘড়ি ধরে। বেঁধে দেওয়া সময় মতন। এই 'ওপেন হাউস' ব্যাপারটা আমি এখানেই প্রথম দেখলাম। দেশে ঈদের দিনে তো নয়ই, পুরো বছরেই কারো বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার আগে ফোন করার প্রচলন কখনো ছিলনা। এখানে তো আমার পাশের অ্যাপার্টমেন্ট-এ টোকা দেওয়ার আগেও আমায় ফোন করে নিতে হয়। ঈদের আগেই ফোনে বা ই-মেলে সবার 'ওপেন হাউস'-এর টাইম টেব্‌ল জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যার যার দেওয়া সময়ানুযায়ী সেই নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ মেনে তার বাড়ী যাওয়া।

আর একটা নতুন বিষয় যা চোখে পড়ে তা হল খাবার তৈরীর একটা প্রতিযোগিতা। দেশে তো বাঁধা কিছু ঐতিহ্যবাহী ঈদের খাবার আছে। মা-খালারা রাত জেগে সে কয়টিই তৈরী করেন। এখানে সেই traditional খাবারের পাশাপাশি আরো দেশী বিদেশী নানান রকম মিলিয়ে যা খাবার মহিলারা তৈরী করেন তা একেক বাড়ীতে বিশ পঁচিশ রকমও ছাড়িয়ে যায়।

কোরবাণী ঈদে তো আনন্দ হৈচৈ এর পাশাপাশি রয়েছে ধর্মীয় দায়িত্বেরও একটা ব্যাপার। দূরে কোথাও ফার্ম বা Ranch এ গিয়ে পশু জবাইয়ের পর বাড়ীতে মাংস রেখে কোন চ্যারিটি ফাউন্ডেশনে বাকিটা দান করে দেওয়া অথবা Concerned Muslim Organization গুলোতে পুরো টাকাটাই দান করে দেওয়া। দেশের মত বাড়ীর পেছনে, মাঠে, উঠোনে, বা ইদানিং কালের গ্যারেজে পশু জবাই, মণের পর মণ মাংসের ব্যবস্থাপনা, কসাইএর সাথে দর কষাকষি, দরজা ভেঙে পড়া ভিক্ষুকদের চাহিদা মেটানো, এ সব ঝামেলা বা আনন্দ কোনটাই এখানে নেই।

অন্যরকম অনেক কিছুই। তবু তার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয় পুরনো আনন্দগুলোকে, বা হয়ত একটু নতুন আনন্দকেই। তারপরও কেন যেন ঈদের সকালে মনটা একটু ফাঁকা হয়ে যায় – বাবার অহেতুক হৈচৈ করা অস্থির কন্ঠস্বরের জন্য, মার ক্লান্ত মুখের তৃপ্ত হাসিটুকুর জন্য, শেষ ইফতারের গমগমে আজানের ধ্বনিটার জন্য। মনে হয় এতবছর ধরে কাটিয়ে আসা সেই ঈদগুলোর অন্যরকম একটা ছেলেবেলার মিষ্টি গন্ধ ছিল। এতবছর পরও মনটা বড় উচাটন হয় সেই গন্ধটার জন্য।